হেলিজ্যাপাটার আশ্চর্য প্রাণীরা (পর্ব-২)

খন্দকার জাহিদ হাসান

(নতুন পাঠক-পাঠিকাদেরকে প্রথমে পর্ব-১ পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।)

হেলিজ্যাপাটা গ্রহের সমুদ্রতীরে এক প্রত্যূষে ক্লারা হার্ডিং একটা বড় পাথরের উপর একা বসেছিল। 'ইউকানাস্' নামের সূর্য উঠতে তখনো অনেক দেরী ছিলো। অনেকক্ষণ আগে পূর্ণ চাঁদ ফুবিয়ানা ডুবে গেছে। ভেল্‌সিনা নামের চাঁদটি তার আধখানা দেহ নিয়ে তখনো মাঝ-আকাশে শোভা পাচ্ছিলো। ক্লারা যেখানে বসেছিলো, সেখান থেকে সামান্য দূরেই তাদের হাল্‌কা নীল রঙের ঝক্‌ঝকে ফ্ল্যাট্। কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হোয়ে গেছে। পুরোটা সময় ধরেই ক্লারা বৃষ্টিতে ভিজেছে। বৃষ্টিতে ভেজা তার অতি প্রিয় একটা ব্যাপার।

আজকাল তার কেন যেন কেবলই মনে হয় যে, এভাবে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকলেই একদিন সে তার মৃত মায়ের কাছে পৌঁছে যেতে পারবে। একটা বড়ো কোনো গাছের নীচে ভিজতে পারলে মায়ের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এই ব্যাপারটি আরো সহজ হোয়ে যেতো বলে তার বিশ্বাস। কিন্তু সমস্যা হলোঃ এই গ্রহে গাছ-গাছালির চিহ্নমাত্র নেই। তাই অগত্যা শুধু খোলা আকাশের নীচেই সে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকতো।

শুধু ক্লারা নয়, তার সংগী-সাথীদের সকলেই বৃষ্টিতে ভিজতে দারুণ পছন্দ করতো। সর্দি-কাশির কোনো ভয় নেই এখানে। আসল কথা, হেলিজ্যাপাটাতে ভাইরাস বা অন্য কোনো রোগজীবাণুই নেই। অসুখ-বিসুখ হবেটা কী ক'রে!

তাদের বিজ্ঞান শিক্ষিকা মিস্ তেন্‌মিচা সাওলাবুনা বলেছেন যে, এই গ্রহে শুধুমাত্র পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে অল্প কিছু জীবাণু রয়েছে এবং এরা নাকি কোনো প্রাণীদেহেই কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না।

একেকটা পোষাক থাকে, যা অনেক সাদামাটা চেহারার মানুষকেও সুন্দর ক'রে তোলে। ক্লারার পরণেও ওর নিজহাতে তৈরী এ-রকম একটা উজ্জ্বল বেগুনী রঙের পোষাক ছিল। পোষাকের কাপড়টি এই গ্রহের এক ধরণের সমুদ্র-শৈবাল থেকে আহরিত তন্তু দিয়ে তৈরী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলোঃ জলের ফোঁটা যেমন কচুপাতা বা পদ্মপাতাকে ভেজাতে পারে না, এই কাপড়েও তেমনি বৃষ্টির পানি কিংবা শিশিরবিন্দু আট্‌কাতে পারে না, মুহূর্তেই নীচে ঝরে পড়ে।

বাংলা কবিতা ও ছড়া লিখা ছাড়াও ক্লারার আরেকটি প্রিয় সখ ছিলো সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরী করা। ওর বন্ধু-বান্ধবদের বেশীর ভাগ পোষাকই ছিলো তার হাতের তৈরী। যদিও ক্লারাকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না, তবু ওর চেহারাতে এক ধরণের বিশেষত্ব ছিলো। ওর চেহারার এই বৈশিষ্ট্য, বেশ-ভূষা, কথা বলার ধরণ, সরলতা আর আন্তরিকতার কারণে সবাই ওকে খুব পছন্দ করতো।

সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে ছিলো ক্লারা। আনমনে ভাবছিলো ফেলে আসা দিনের কথা। নিউইয়র্কের এক ঘিঞ্জি বস্তিতে থাকতো ওরা তখন। ওর বাবা-মার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর 'রবার্ট' নামের এক লম্পটের সাথে তার মায়ের বিয়ে হোয়েছিলো। এই হতচ্ছাড়া লোকটা ক্লারাকে একদম সহ্য করতে পারতো না। সুযোগ পেলেই তাকে মারধোর করতো।

এক শীতের কোনো এক দুপুরে শপিং মলে কেনাকাটা শেষ করার পর ক্লারা তার মায়ের সাথে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলো। হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় তারা দু'জন রাস্তার ধারের এক বিরাট গাম গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলো। এখনো সেই দিনটির কথা মনে পড়লে তার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে এবং এক অব্যক্ত ধরণের ব্যথা-মেশানো সুখের অনুভূতি ওর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

ক্লারার আজো মনে আছে, গাম গাছের নীচে প্রথমদিকে বেশ কিছুক্ষণ তাদের কারো গায়েই বৃষ্টির কোনো ফোঁটা পড়েনি। তার মা ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছিলেন। গাম গাছের বড় বড় পাতায় হাজার হাজার বৃষ্টির ফোঁটা রিম্‌ঝিম্ শব্দ তুলে আছড়ে পড়ছিলো, আর ক্লারা দু'হাত দিয়ে তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কতো কি ভাবতে ভাবতে যেন এক সুন্দর স্বপ্নের রাজ্যে চলে গিয়েছিলো।

অবশ্য বেশীক্ষণ তার সেই স্বপ্ন স্থায়ী হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছের পাতা-বেয়ে-আসা বৃষ্টির পানি তাদের মা-মেয়ে দু'জনকেই ভিজিয়ে দিতে শুরু করলো। মা ক্লারাকে তাঁর সারা শরীর দিয়ে আগলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলেন, যেন সে ভিজে না যায়। ঠক্‌ঠক্ ক'রে ভয়ানকভাবে কাঁপছিলেন মা। অবশ্য ক্লারা নিজে তেমনভাবে ভেজেনি বলেই তার খুব একটা খারাপ লাগছিলো না। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেলে তারা বাসায় ফিরে গিয়েছিলো।

সে রাতেই তার মায়ের ভীষণ জ্বর এসেছিলো। তার সৎ বাবা শুধুমাত্র একবার তার মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো, এরপর আর কখনো কোনো খোঁজ-খবর রাখেনি। ক্লারা তখন এত ছোটো ছিলো যে, কিভাবে তার মাকে সাহায্য করবে, সেটাও বুঝে উঠতে পারছিলো না। তাদের তখন তেমন কোনো নিকটজনও ছিলো না। অসুখটা ছিলো নিউমোনিয়া। কয়েকদিন অসুখে ভোগার পর এক সন্ধ্যায় তার মা মারা গেলেন। ক্লারার বুঝতে অনেক সময় লেগেছিলো যে, ওর মা আর নেই। কারণ মৃত্যুর পরও

মায়ের খোলা চোখের দৃষ্টি ক্লারার দিকে আট্‌কে ছিলো। আর সে দু'চোখে ছিলো দু'ফোঁটা অশ্রু।

ক্লারার মায়ের মৃত্যুর পর ওর সৎ বাবা রবার্ট পরদিনই আরেক মহিলাকে ঘরে তুলে এনেছিলো। এরপর ক্লারার উপর নির্যাতন আরো বেড়ে গেল। এক সন্ধ্যায় সামান্য চা তৈরীর খুঁত ধরে রবার্ট ওর সাথে ভীষন রাগারাগি শুরু করলো এবং এক পর্যায়ে তাদের তিনতলা ফ্ল্যাটের জানালা দিয়ে ওকে নীচে ছুঁড়ে দিতে উদ্যত হলো।

ঠিক সেই সময় ক্লারা দেখতে পেলো যে, অদ্ভূত ধরণের একটা আকাশযান খুব নীচু দিয়ে ধীর গতিতে উড়ে যাচ্ছে। তীব্র এক আলোর ঝল্‌কানিতে সে জ্ঞান হারিয়েছিলো। আবার জ্ঞান ফিরে আসার পর ক্লারা নিজেকে আবিষ্কার করলো এক অত্যাধুনিক উড়ন্ত যানের ভেতর 'সেক্লেম্যুরান' নামের আশ্চর্য একদল মহাজাগতিক প্রাণীর তত্ত্বাবধানে।

হঠাৎ ক্লারার চিন্তায় ছেদ পড়লো। এক অসাধারণ মানবকন্ঠের মন-কেড়ে-নেয়া সুরে সে সম্বিত ফিরে পেলো। কবীর গাইছে। প্রতিদিন ভোরে সে এইভাবে তাদের ফ্ল্যাটের ছাদে গান গায়। যদিও ক্লারা নিশ্চিত নয়, তবু এ কথা ভাবতে তার বড়ো ভালো লাগে যে, কবীর প্রতিদিন তাকে উদ্দেশ্য ক'রেই গান গায়। একদিন কি সে কবীরকে জিজ্ঞেস করবে যে, তার সব গান ক্লারাকে উদ্দেশ্য ক'রেই গাওয়া কি না? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ক্লারার মনটা খারাপ হোয়ে গেল। মানুষ কিভাবে এত সুন্দর গায়!

দূর সাগরে ঢেউয়ের উপর তখন কয়েকটা কাঁকড়া-সদৃশ গেটাস্পোর তাদের প্রাতঃকালীন সাঁতার প্রতিযোগিতায় রত ছিলো। সেদিক পানে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লারা এক সময় আবার আনমনা হোয়ে পড়লো।

সেক্লেম্যুরান্‌দের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞান পরিষদের প্রধান মিসেস জ্যান্টি ভিউওনা এবং মানব-সন্তানদের জন্য পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিঃ মোদি র‍্যালাওকের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিলো। সেটি নিম্নরূপঃ-

মিসেস ভিউওনাঃ তা হলে আপনি বলছেন যে, শুধু ক্লারাকে নিয়েই কিছুটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার রয়েছে, আর বাকী সকলে ভালোই আছে?
মিঃ র‍্যালাওকঃ শারীরিক ভাবে সবাই ভালোই আছে। এই গ্রহে কোনো রোগজীবাণু নেই ব'লে তেমন কোনো অসুখ-বিসুখও নেই। শুধু একজনের রয়েছে বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া সামান্য নাকের সমস্যা। আর দু'জনের অম্লাধিক্যজনিত মৃদু সমস্যা আছে। তবে মানসিকভাবে কেউই তেমন ভালো রয়েছে বলে মনে হয় না।

মিসেস ভিউওনাঃ কি ধরণের মানসিক সমস্যা, একটু খুলে বলবেন কি?
মিঃ র‍্যালাওকঃ যেমন ক্লারার মধ্যে পৃথিবীর প্রতি এক ধরণের টান রয়ে গেছে। পৃথিবীর ব্যাপারে বাকী কয়জনের মধ্যে আগ্রহ বলা যায় শূন্যের কোঠায়। এর সম্ভাব্য কারণ হলো, সেখানে তাদের প্রত্যেকের-ই অতীত জীবন খুব দূর্বিষহ ছিলো।

মিসেস ভিউওনাঃ কিন্তু পৃথিবীতে ক্লারার জীবনও তো সুখের ছিলো না! তা হলে ওর বেলায় এর ব্যতিক্রম হলো কেন?

মিঃ র‍্যালাওকঃ হ্যাঁ, তা সত্যি.....এবং এখানেই আমাদের হিসেবটা মিলছে না। মেয়েটা যে পৃথিবীতে খুব ফিরে যেতে চায়, ঠিক তা নয়। তবে মুস্কিল হলো, ওর ফেলে আসা জীবনকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। আবার এখানকার জীবনের ব্যাপারেও তার মধ্যে আগ্রহের অভাব রয়েছে। এছাড়াও অবুঝ ধরণের অত্যন্ত অবাস্তব গোছের একটি ইচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে। আর তা হলো, ওর মায়ের কাছে যাওয়া। অন্যান্যদের মধ্যে তেমন কোনো ধরণের পাগলামী না থাকলেও এখানকার জীবনযাত্রার ব্যাপারে অস্বাভাবিক নিস্পৃহতা লক্ষ্য করা যায়।

মিসেস ভিউওনাঃ এর কারণ কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন, মিঃ র‍্যালাওক?

মিঃ র‍্যালাওকঃ দেখুন, ব্যাপারটা মনে হয় আপনিও কম-বেশী বোঝেন। এই গ্রহে ওরা যে জীবন-যাপন করছে, সেখানে ওদের সামনে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই, যা বেঁচে থাকার মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করতে পারে। তারপর সামাজিকতাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু শুধুমাত্র চব্বিশজনের মধ্যে কী-ই বা এমন সামাজিকতা সম্ভব, বলুন! আমাদের সেক্লেম্যুরানদের সাথেও তাদের ওঠা-বসা সম্ভব নয়, অনেক রকমের অসুবিধা রয়েছে তাতে।

মিসেস ভিউওনাঃ আচ্ছা, ওদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাড়িয়ে দিয়ে দেখলে কেমন হয়?

মিঃ র‍্যালাওকঃ মিসেস ভিউওনা, আমরা ওদেরকে বিজ্ঞান ও গণিত শেখাচ্ছি, মহাকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করছি। আপনি তো জানেন যে, শেখানোর ব্যাপারে আমাদের যুগান্তকারী 'ডাউন লোড' পদ্ধতি ওদের জন্য ব্যর্থ প্রমাণিত হোয়েছে। তার মূল কারণ হলো, মানুষের শরীর সিলিকনভিত্তিক নয়। অবশ্য পদ্ধতিটা অল্প মাত্রায় হলেও কিছুটা সুফল দিয়েছে- মানব শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে অত্যন্ত কার্যকরী কল্পচিত্র তৈরীর মাধ্যমে শেখার বেগকে দ্রুততর ক'রেছে।

যাই হোক, মানুষের সাংস্কৃতিক দিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাই এক্ষেত্রে আমাদের হস্তক্ষেপ করা বোধ হয় সাজে না। এই ব্যাপারটা পুরোপুরি ওদের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, এদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভালো গাইতে পারে। নিজেরা নিজেরাই শিখেছে। ওদিকে ক্লারা নামের মেয়েটি কিন্তু খুব ভালো কবিতা লিখে- বাংলা ভাষাতে! গাইয়েদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো করছে কবীর নামের বাংলাদেশী ছেলেটি। জেনে অবাক হবেন মিসেস ভিউওনা, কবীর অবিকল আমাদের অর্থাৎ সেক্লেম্যুরানদের মতোই গায়। অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে সে যখন গান ধরে, তখন ওর বাকী সংগী-সাথীরা সবাই একেবারে চুপ মেরে যায়। সকলেই কবীরের গানের দারুণ ভক্ত। তবে ওর সবচাইতে বড় ভক্ত হলো ক্লারা।

মিসেস ভিউওনাঃ তা হলে আপনারা ওকে দিয়েই ক্লারার 'বিষণ্নতা' সমস্যাটির সমাধান করছেন না কেন?

মিঃ র‍্যালাওকঃ ব্যাপারটি কি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়? তবে মজার ব্যাপার হলো, কবীরের সাথেই ক্লারার যতো ঝগড়া-ঝাটি, মান-অভিমান, আবার কবীরের সাথেই ওর যতো বনিবনা ও ভাব।

মিসেস ভিউওনা (হাসতে হাসতে)ঃ এই লক্ষণটা তো শুভই! আমার মনে হয়, গোটা মহাবিশ্ব জুড়েই ভালোবাসার পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে এই ধরণের সম্পর্কটি চিরন্তন!

মিঃ র‍্যালাওকঃ তা বটে। ওরা দু'জন ক্রমশঃ যে ভাবে ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে, তাতে ক্লারা একদিন পুরোপুরি ঠিক হোয়েও যেতে পারে।

মিসেস ভিউওনা (মুচ্‌কি হেসে)ঃ আচ্ছা, মানব-সন্তানদের মধ্যে হৃদয়গত ব্যাপার-স্যাপারের চিত্রটি কেমন?

মিঃ র‍্যালাওকঃ খুব-ই আশাপ্রদ। কাকতালীয়ভাবে ওদের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ের সংখ্যা সমান সমান এবং জুটি বাঁধার প্রক্রিয়াটিও বড়ো অপূর্ব! তবে প্রথমদিকে একটু প্যাঁচ বেধেছিলো আশা, পল ও সিসায় নামের তিনজন তরুণ-তরুণীর মধ্যে 'ত্রিভূজ প্রেম'-এর কারণে। সুখবর হলোঃ সেই প্যাঁচটি সম্প্রতি খুলে গেছে। শেষাবধি ভারতীয় আশা জুটি বেঁধেছে কেনীয় সিসায়ের সাথে, আর ইংরেজ পলের ভাব জমেছে মধ্যপ্রাচ্যের মেয়ে রাহ্‌নুমার সাথে।

মিসেস ভিউওনাঃ মিঃ মোদি র‍্যালাওক, খুব খুশী হলাম এই তথ্যগুলো পেয়ে। আমার মনে হয়, আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত প্ল্যান 'বি'-ই বেছে নিতে হচ্ছে এবং তা অতি সত্বর। আগামীকাল সকালেই বিদ্যালয়ে সকলের সামনে এই পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করা হবে। আমি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে ওখানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনিও এ ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করুন।

মিঃ র‍্যালাওকঃ অবশ্যই সাহায্য করবো। আচ্ছা, মিসেস ভিউওনা, একটা কথা। মানব-সন্তানদেরকে কোনোভাবেই কি পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়?

মিসেস ভিউওনাঃ জ্বী না। প্রথমতঃ পৃথিবীতে যাওয়ার মতো অত্যন্ত ব্যয়বহুল আরেকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সেখানে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেও আমাদের আশংকা, পরিবর্তিত পৃথিবীতে খুব অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন এক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়বে ওরা!!

মিঃ র‍্যালাওকঃ কেন? ভালো পরিবেশও তো সৃষ্টি হতে পারে!

মিসেস ভিউওনাঃ সে সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগেরও কম। আপনি তো জানেন যে, সেক্লেম্যুরানদের ইকারা-৭ অভিযানকালে তারা সৌরমন্ডল এলাকায় বেশ কয়েকটি কৃত্রিম গ্রহ স্থাপন ক'রে এসেছিলো। সেগুলো পৃথিবীতে মানুষের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে আমাদেরকে যে সকল তথ্য পাঠিয়েছে এবং এখনো পাঠাচ্ছে, তা মোটেও সুখকর নয়।

মিঃ র‍্যালাওকঃ কি ধরণের তথ্য পাঠিয়েছে?

মিসেস ভিউওনাঃ যেমন, গ্লোব্যাল ওয়র্মিং-এর কুফল হিসাবে পৃথিবীর স্থলভাগের অনেকাংশ সাগরের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ এমন

ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে যে, শিগ্রী পৃথিবী মানুষের বসবাসের প্রায় অযোগ্য হোয়ে পড়বে। মানুষের পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে স্থূলকায়ত্ব সমস্যা প্রকট হোয়ে স্বাভাবিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেংগে পড়ছে। মানুষে মানুষে হানাহানি ও অবিশ্বাস আরো অনেক বেড়ে গেছে। ছোটো-বড়ো সব ধরণের অপশক্তির অত্যাচার ও শোষণের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, ইত্যাদি।
যাই হোক, আজ এখানেই শেষ করা যায়। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। শুভ বিদায়, মিঃ র‍্যালাওক।
মিঃ র‍্যালাওকঃ শুভ বিদায়, মিসেস ভিউওনা!

পরদিন সকালে হেলিজ্যাপাটার সাগর-তীরে অবস্থিত বিদ্যালয়ের সামনের প্রাংগণে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে চব্বিশজন মানব শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য অগণিত সেক্লেম্যুরানের উপস্থিতিতে সেই গ্রহের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞান পরিষদের প্রধান মিসেস জ্যান্টি ভিউওনা এক অসাধারণ বক্তৃতা দিলেনঃ-

উপস্থিত সেক্লেম্যুরান ভাই ও বোনেরা এবং আমার আদরের মানব-সন্তান সোনামণিরা! এই মুহূর্তে খুব অল্প কথায় আমি এক অতি মূল্যবান তথ্য আপনাদের সকলের সামনে প্রকাশ করবো। আমাদের এই প্রিয় গ্রহ হেলিজ্যাপাটাকে কেন্দ্র যে দু'টি উপগ্রহ ঘুরে চলেছে, নিশ্চয় আপনারা সবাই তাদের নাম জানেন। তাদের একটি হলো, ফুবিয়ানা ও অন্যটি ভেল্‌সিনা।

এটা আমাদের অতি লজ্জার ব্যাপার যে, আমরা নয়শ' পাঁচ আলোকবর্ষ দূরে আবস্থিত সৌর মন্ডল চষে বেড়িয়েছি, অথচ আমাদের ঘরের কাছে অবস্থিত এই দু'টি উপগ্রহের ব্যাপারে খুব সামান্যই আগ্রহ দেখিয়েছি। প্রদীপের আলো অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকলেও তার ঠিক তলাটি কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এ যেন অনেকটা সে-রকম একটি ব্যাপার!

যাই হোক, আপনারা সবাই জানেন যে, আমাদের দু'টো চাঁদের শুধুমাত্র একটি ক'রে পিঠ আমরা দেখতে পাই। এদের উল্টো পিঠ দু'টো এতদিন কিভাবে যেন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি ব্যাপক গবেষণা, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, গোটা ফুবিয়ানাতেই কোনো পানি বা জীবনের অস্তিত্ব নেই। আমাদের দিকে মুখ ক'রে থাকা ভেল্‌সিনার পিঠটিরও এক-ই অবস্থা। কিন্তু এর উল্টো পিঠে পাহাড়-পর্বত ছাড়াও রয়েছে দু'টো সাগর, অসংখ্য জলাশয়, হ্রদ ও নদী। এই উল্টো পিঠটি যদি আমাদের দিকে অবস্থান করতো, তবে এখান থেকে ভেল্‌সিনাকে আরো অনেক বেশী উজ্জ্বল দেখাতো। আয়তনের দিক থেকে এই উপগ্রহটি পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক।

সবচেয়ে যা বিস্ময়কর, তা হলোঃ এই উপগ্রহটিতে রয়েছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং কার্বনভিত্তিক এক বিশাল জীব-জগৎ। পৃথিবীর মতো এখানেও রয়েছে গাছপালা ও ছোটো-বড়ো অগণিত জলচর ও স্থলচর প্রাণী। কিছু কিছু প্রাণী হিংস্র বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে তেমন কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর

অস্তিত্ব এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। এখন ভেল্‌সিনার জীব-জগতের উপর একটি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে।

উপস্থিত সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে বিশাল মনিটরিং স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে আগাগোড়া চলচ্চিত্রটি উপভোগ করলো। মানব-সন্তানদের কাছে মনে হচ্ছিলো যে, তারা যেন পৃথিবীর কোনো ছায়াছবি দেখছে। তবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিলো এই যে, ভেল্‌সিনার আকাশের রং সবুজ এবং ঘাস ও গাছপালা নীল রঙের। ওখানকার কোনো প্রাণীই দেখতে হুবহু পৃথিবীর কোনো প্রাণীর মতো না হলেও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। পাখীও দেখা গেল হরেক রকমের। পালক-ঢাকা শরীরের পাখীগুলোর গলার স্বর কিছুটা কর্কশ বলে মনে হলো। একটা ঝর্ণার জলে ওদের স্নান করার দৃশ্যটি ছিলো সত্যিই মনোহর!

কবীর তার পাশেই বসা ক্লারার কানে কানে বল্‌লো, ''কেন যেন আমার মন বলছে, এখানেই আমাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পাঠানো হবে। তোমার কি মতামত ক্লারা?'' ক্লারার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতে চাইছিলো না। স্বপ্নোত্থিত মানুষের মতো সে উত্তর করলো, ''আমার এখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে, আমি স্বপ্ন দেখছি না!'' কবীর বাগ্‌ড়া দিলো, ''ওসব কথা ছাড়ো। আমি জানতে চাচ্ছি, যদি সত্যিই আমাদেরকে ওখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে তুমি যেতে রাজী কি না!?'' ক্লারা শুধু উচ্চারণ করলো, ''এমন একটা জায়গায় যেতে পারলে ধন্য হোয়ে যেতাম! তুমি কি বলো কবীর?'' কবীর গভীর আবেগের সাথে বল্‌লো, ''তুমি যেতে রাজী থাকলে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই!'' ক্লারা আবার মুখ খুল্‌লো, ''কিন্তু সত্যিই কি ওরা আমাদেরকে ওখানে পাঠাবে....?''

ক্লারার মুখের কথা শেষ না হতেই মিসেস জ্যান্টি ভিউওনার মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে ঘোষণা শোনা গেল, ''আমাদের তত্ত্বাবধানে এতদিন বড়ো হওয়া মানব-সন্তানদের আগামী দিনের আবাসস্থলঃ
ভে-ল্-সি-না.....!!!''

মানব-সন্তানদের তুমুল করতালি ও সেক্লেম্যুরানদের মুহুর্মুহু আনন্দ-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হোয়ে উঠলো। আশেপাশে কোনো পাহাড় বা দেয়াল না থাকা সত্ত্বেও মিসেস জ্যান্টি ভিউওনার সেই ঘোষণার আওয়াজ যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হোয়ে সুদূর মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়লো।

পৃথিবীর সময় হিসাবে ঠিক ২০১০ সালের মার্চ মাসের আঠারো তারিখে চব্বিশজন মানব-সন্তান ও বিভিন্ন কাজে দক্ষ পঞ্চাশজন সেক্লেম্যুরানকে বহন ক'রে এক মেগা-স্পেস্‌ক্রাফ্‌ট্‌ ভেল্‌সিনা উপগ্রহের আকাশে উপস্থিত হলো। বিশালাকৃতির অতি সাধারণ একটি বেলুনে চড়ে তারা সবাই যখন ভেল্‌সিনার একটি নীল উপত্যকায় অবতরণ করছিলো, তখন ইউকানাস নামের সূর্যটি ডুবে যাওয়ার পথে। হেলিজ্যাপাটা স্থায়ীভাবে অদৃশ্য হোয়ে গিয়েছিলো। একপাশে অবস্থিত বিরাট এক হ্রদের বুকে হাল্‌কা সবুজ রঙের আকাশটি প্রতিফলিত হচ্ছিলো। চারিদিকে নানান ধরণের পাখীর কলরব শোনা যাচ্ছিলো।

ভেল্‌সিনা উপগ্রহের দিন ও রাতগুলো তেমন দীর্ঘ নয়। সেক্লেম্যুরানদের সাহায্যকারী কর্মী-বাহিনী মোট আটষট্টি দিন সেই উপগ্রহে অবস্থানের পর আবার হেলিজ্যাপাটাতে ফিরে গেল। যাওয়ার আগে তারা মানব-সন্তানদের জন্য পাহাড়ের গায়ে চমৎকার সব বাড়ী তৈরী করলো, একটা ছোটো-খাটো হাওয়া-চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসালো, হেলিজ্যাপাটার সাথে মানব-সন্তানদের হলোগ্রাফিক যোগাযোগের জন্য স্থাপন করলো আধুনিক ধরণের একটি প্ল্যান্ট, বেশ কিছু রাস্তাও বানিয়ে দিলো, আর প্রচূর সুস্বাদু ফলের গাছের সন্ধান দিলো। সেই সাথে রেখে গেল হরেক রকমের যন্ত্রপাতি, বন্দুক, বর্শা, জাল এবং মাটি থেকে সামান্য উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত 'হ্যাকিন্টক' নামের একত্রিশটি যানবাহন। (হ্যাকিন্‌টক ইউকানাসের আলো থেকে তার শক্তি আহরণ করতো।)

ভেল্‌সিনা থেকে হেলিজ্যাপাটা গ্রহকে দেখতে পাওয়া যেতো না বলে সবার মনেই ভীষণ দূঃখ ছিলো। কিন্তু চোখে দেখা না গেলেও তারা এই গ্রহটির কথা কোনোদিনও ভুলবে না। আর সেই গ্রহটির অতিশয় বুদ্ধিমান, দয়াশীল ও বিশাল হৃদয়ের অধিকারী আশ্চর্য প্রাণী সেক্লেম্যুরান, যারা এখনো প্রতিদিন তাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছে ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিচ্ছে- তাদের কথা, তাদের অফুরন্ত স্নেহ-ভালোবাসার কথা চিরকাল তারা মনে রাখবে।

ভেল্‌সিনার ছোটো ছোটো দিনগুলো দ্রুত কেটে যাচ্ছিলো। দু'বেলা দু'টো খেলেই সবার দিব্যি চলে যেতো। হ্যাকিন্‌টকে চড়ে দিনভর সবাই পাখী আর ছোটো ছোটো প্রাণী শিকার ক'রে বেড়াতো, কিংবা হ্রদের বুকে তিন-পা-ওয়ালা মাছ ধরে সময় কাটাতো, অথবা বনে-জংগলে ঘুরে ঘুরে ফল-মূল সংগ্রহ করতো। । আশা ও ক্লারা প্রথম প্রথম প্রাণী-হত্যার ব্যাপারে খুব মন খারাপ করতো। কিন্তু পরে এক সময় তারা ব্যাপারটা মেনে নিলো। খেয়ে-পরে বাঁচতে তো হবে! নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন সবার উপরে।

একদিন ক্লারা হঠাৎ বেঁকে বসলো, ''আজ আর কোনো শিকার-টিকার নয়, আজ হবে শুধু ফল পাড়া। তোমরা সবাই তোমাদের হ্যাকিন্‌টক ঘোরাও জংগলের দিকে।''

দ্বিধাগ্রস্থতার মধ্যেও সবাই ক্লারার কথা মেনে নিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে অভাবনীয় সুফল পাওয়া গেল, তাতে ওদের জীবন অন্যদিকে মোড় নিলো। তারা অসংখ্য বড়ো বড়ো গাছের বিশাল এক বন আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লো। ক্লারা সবার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো, ''আমি এই গাছগুলো চিনি। এগুলো নিঃসন্দেহে রুটিফলের গাছ! চলো আমরা ফলগুলো পরীক্ষা করি।''

বিরাট আকারের কয়েকটি কাঁচা ও পাকা রুটিফল খাদ্য-নির্ধারক-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হলো। সবাই অত্যন্ত আনন্দের সাথে পর্যবেক্ষণ করলো যে, ফলগুলোতে বিষ বা মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর অন্য কোনো উপাদান নেই, অথচ প্রচূর পরিমাণে শ্বেতসার, শর্করা ও ভিটামিন রয়েছে। আরো সুখবর হলোঃ কাঁচা ফলগুলো সরু সরু ফালিতে কেটে সেঁকলে খেতে একদম রুটির মতো লাগতো এবং মারুন্তা বীজের তেলে ভাজলে তা হোয়ে যেতো পরোটা। আবার একেবারে মজে যাওয়া পাকা ফলের নরম শাঁস দিয়ে খুব-ই সুস্বাদু পায়েশ রান্না করা যেতো।

যা হোক, এইভাবে ভেল্‌সিনা উপগ্রহে হাসি আর গানে ভরে উঠলো মানব-সন্তানদের জীবন।

এক সন্ধ্যায় ক্লারা চুপচাপ তাদের বাসার জানালার কাছে বসেছিলো। বাইরে চারিদিকে ফুবিয়ানা তার স্নিগ্ধ জোছনা ছড়িয়ে দিয়েছিলো। কবীর মৃদু কণ্ঠে বল্‌লো, ''কি হলো, কথা বল্‌ছো না যে!'' ক্লারা কোনো সাড়া দিলো না। কবীর তাড়া দিলো, ''পাগলামী কোরো না ক্লারা, এখানকার রাত খুব ছোটো! দেরী হোয়ে যাচ্ছে তো! তোমার নতুন কবিতাটা আমাকে শোনাবে না?''
ক্লারা নীরবে মাথা নাড়লো। কিন্তু তার ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়লো অনির্বচনীয় এক রহস্যময় হাসি।

বাইরে হঠাৎ একটা অদ্ভূত পাখীর মিনতি-ভরা ডাক শোনা গেল। কবীরের মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগে বাংলা-মায়ের বুকে ফেলে আসা এক সোনালী বিকেলের কথা। একটা পাখী তাদের বাসার পেছনের জংগলটাতে ডাকছিলোঃ বউ কথা কও! অনেক চেষ্টা ক'রেও কবীর সেদিন পাখীটাকে খুঁজে পায়নি। কিন্তু তার ডাকটা সে ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছিলো।

(তারও অনেকদিন পরে ১৯৯৮ সালের মে মাসের এক রাতে তাদের সেই বাঁশের তৈরী বাসাটিতে আগুন লেগে কবীরের বিধবা মা মারা গিয়েছিলেন এবং সে রাতেই সেক্লেম্যুরান অভিযাত্রীরা কবীরকে সেখান থেকে উদ্ধার করেছিলো।)

এতদিন পরে এত দূরের এক জগতে ভেল্‌সিনা নামের এক উপগ্রহের এক সুন্দর সন্ধ্যায় হুবহু একই ভাবে দুষ্টু একটা পাখী পাগলের মতো ডেকে চলেছিলোঃ 'বউ কথা কও! বউ কথা কও!!'

অনেকক্ষণ পরে এক সময় পাখীর গান থেমে গেল। যন্ত্রণামিশ্রিত এক প্রগাঢ় ধরণের সুখ ছড়িয়ে পড়লো কবীরের সারা বুকে!!! আস্তে আস্তে ক্লারা উঠে দাঁড়ানোর পর কবীরের সেই পোড়-খাওয়া বুকে তার মাথা রাখলো। তারপর মৃদু স্বরে বল্‌লো, ''তুমি এত বোকা কেন, বলো তো? আমরা শিগ্রী তিন জন হচ্ছি, এটা বুঝতে এত দেরী হয় কারো?''

কবীর যেন আকাশ থেকে পড়লো। তার বুঝতে বেশ সময় লাগলো যে, এই মাত্র সে তার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সু-সংবাদটি পেলো। ওর বুকটা তোল্‌পাড় করতে লাগলো। সে কিছু একটা বলে ওঠার আগেই ক্লারা আবার মুখ খুল্‌লো, ''একটা গান গাও তো!''

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১১/০২/২০০৬